# আপন কথায় অবন ঠাকুর

## সুবিমল মিশ্র

পরিণত বয়সে শৈশব স্মৃতি লিখতে বসে অবনীন্দ্রনাথ (৭.৮.১৮৭১-৫.১২.১৯৫১) 'আপনকথা'র (গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ) উৎসর্গ পত্রে 'মনের কথা'য় লিখেছেন—

> আমার ভাব ছোটদের সঙ্গে— তাদেরই দিলেম এই লেখা খাতা। আর যারা কিনে নিতে চায় পয়সা দিয়ে আমার জীবন-ভরা সুখ দুঃখের কাহিনী, এবং সেটা ছাপিয়ে নিজেরাও কিছু সংস্থান করে নিতে চায় তাদের আমি দুর থেকে নমস্কার দিচ্ছি। যারা কেবল শুনতে চায় আপনকথা, থেকে থেকে যারা কাছে এসে 'গল্প বলো' সেই শিশু-জগতের সত্যিকার রাজা-রাণী বাদশা-বেগম তাদেরই জন্য আমার এই লেখা খাতা ক'খানা। শিশু সাহিত্য-সম্রাট যাঁরা এসেছেন এবং আসছেন তাঁদের জন্য রইলো বাঁহাতে সেলাম; আর ডান হাতের কুর্ণিশ রইল তাদেরই জন্য যারা বসে শোনে গল্প রাজা-বাদশার মতো, কিন্তু ছেঁড়া মাদুর নয়তো মাটিতে বসে; আর গল্পের মাঝে মাঝে থেকে থেকে যারা বক্‌শিশ দিয়ে চলে একটু হাসি, কিম্বা একটু কান্না; মানপত্রও নয়, সোনার পদকও নয়; হয় একটু দীর্ঘশ্বাস, নয় একটুখানি ঘুমেঢোলা চোখের চাহনি।... বলে চাওয়া চলে কেবল তাদের কাছে নির্ভয়ে, মনের কথা বেচা-কেনার ধার ধারেনা যারা, যাত্রা করে বেরিয়েছে যারা, কেউ হামাগুড়ি দিয়ে, কেউ কাঠের ঘোড়ায় চড়ে, নানাভাবে নানাদিকে আলিবাবার গুহার সন্ধানে! ছোটো ছোটো হাতে ঠেস দিয়ে যারা কপাট আগলে বসে আছে, যে দৈত্য সেটাকে জাগিয়ে বলে, 'ওপুন চিসম্'— অর্থাৎ চশমা খোলো, গল্প বলো। যারা থেকে থেকে ছুটে এসে বলে— 'এই নুড়ি ছোঁয়াও দেখবে দাদামশায়, লোহার গায়ে ধরে যাবে সোনা।' কুড়িয়ে পাওয়া পুরনো পিদুম ঘষে ঘষে খইয়ে ফেলে, অথচ ছাড়ে না কিছুতে সাত-রাজার-ধন মানিকের আশা'।

পুস্তক হিসেবে প্রকাশের আগে 'আপনকথা, দুটি সাময়িক পত্রে বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। কোন্ রচনা কোন্ পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল তার একটি তালিকা নীচে দেওয়া হল—

| | | |
|---|---|---|
| পদ্মদাসী | বঙ্গবাণী, ফাল্গুন ১৩৩৩ | চিত্রা, পৌষ ১৩৩৫ |
| সাইক্লোন | বঙ্গবাণী, বৈশাখ ১৩৩৪ | চিত্রা, মাঘ ১৩৩৫ |
| উত্তরের ঘর | বঙ্গবাণী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪ | চিত্রা, ফাল্গুন ১৩৩৫ |
| এ আমল সে আমল | বঙ্গবাণী, আষাঢ় ১৩৩৪ | চিত্রা, চৈত্র ১৩৩৫ |
| এ বাড়ি ও বাড়ি | বঙ্গবাণী শ্রাবণ ১৩৩৪ | চিত্রা, বৈশাখ ১৩৩৬ |
| বারবাড়িতে | বঙ্গবাণী ভাদ্র ১৩৩৪ | চিত্রা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬ |

পত্রিকায় প্রকাশকালে রচনাগুলির শিরোনাম সবসময় গ্রন্থের অনুরূপ ছিল না। শিরোনাম ছিল এরকম—

| গ্রন্থ | বঙ্গবাণী | চিত্রা |
|---|---|---|
| পদ্মদাসী | আপন-কথা | আপনকথা (পদ্মদাসী) |
| সাইক্লোন | আপন-কথা<br>সাইক্লোন | আপন-কথা<br>শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের<br>আত্মজীবনী (সাইক্লোন) |
| উত্তরের ঘর | আপনকথা<br>(ঘর-ঘর) | আপন-কথা শিল্পাচার্য<br>অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের<br>আত্মজীবনী |
| এ আমল সে আমল | আপনকথা<br>(এ আমল সে আমল) | আপন-কথা শিল্পাচার্য<br>অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের<br>আত্মজীবনী<br>(এ আমল সে আমল) |
| বারবাড়িতে | আপনকথা<br>(বার বাড়িতে) | আপন-কথা শিল্পাচার্য<br>অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের<br>আত্মজীবনী (বার-বাড়িতে) |

ল কলেজ ম্যাগাজিনে বৈশাখ ১৩৩৯-এ ব্যাপটাইজ নামে অবনীন্দ্রনাথের একটি স্মৃতিকথা মুদ্রিত হয়। সেই রচনাটি 'আপন-কথা'র অন্তর্গত 'অসমাপিকা'র পাঠান্তর।

যাইহোক ছোটোদের জন্য তার যে ভালোবাসা সঞ্চিত হয়েছিল তার কারণ অসামান্য এই মানুষটি অন্তরে অন্তরে নিজেই ছেলেমানুষ ছিলেন। ছোটোদের সঙ্গে ঠিক ছোটোটি হয়ে তার দৃষ্টিতে সব কিছু দেখার সহজ আনন্দে ভরপুর হয়ে থাকতে তিনি ভালোবাসতেন। তাই একদিন পুরীতে যখন শিশু মোহনলাল বললে, "দেখো দেখো দাদামশায়, লাল চাঁদ উঠেছে। চেয়ে দেখি সূর্যোদয় হচ্ছে। মনে হয় একেবারে মাটি থেকে উঠছে যেন। বলি 'হ্যাঁ হ্যাঁ তাই তো লাল চাঁদই তো বটে!' আমার অবস্থা তার মতোই। সেদিন ছেলেমানুষের চোখে আমিও দেখলাম লাল চাঁদ।" (জোড়াসাঁকোর ধারে, প্রকাশ ৫০ তম সংস্করণ, মে ২০১৯, ১৮শ পরিচ্ছেদ, পৃ ২৮০-৮১)

ছেলেবেলা থেকেই অবনীন্দ্রনাথ প্রকৃতি ও মানুষের বহু বিচিত্র রূপ দেখেছেন, কান পেতে অতি সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশার কথা শুনেছেন, নিবিষ্ট চিত্তে বহু বই পড়েছেন, বহু উপেক্ষিত, তুচ্ছ বস্তুকে ভালোবেসে সংগ্রহ করেছেন। অনেক পরে যখন তিনি ছবি এঁকেছেন, বই লিখেছেন, পুতুল গড়েছেন — সে সময় তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে সঞ্চিত বিষয়কে তুলে এনে তার রূপ ও বাণী দিয়েছেন। খুব সহজে তিনি বলেছেন, 'বাল্যে পুতুল খেলার বয়সের সঞ্চয়— এই শেষ বয়সের যাত্রাগানে, লেখায়, টুকিটাকি ইট, কাঠ কুড়িয়ে পুতুল গড়ায় যে ধরে যাচ্ছি নে তা ভেবো না। সেই বাল্যকাল থেকে মন সঞ্চয় করে এসেছে। তখনই যে সে-সব সঞ্চয় কাজে লাগাতে পেরেছিলুম তা নয়। ধরা ছিল মনে। কালে কালে সে সঞ্চয় কাজে এল; আমার লেখার কাজে, ছবি আঁকার কাজে, গল্প বলার কাজে, এমনি কত কী কাজে তার ঠিক নেই। এই নিয়মে আমার জীবন যাত্রা চলেছে। আমার সঞ্চয়ী মন। সঞ্চয়ী মনের কাজই এই— সঞ্চয় করে চলা, ভাল -মন্দ টুকিটাকি কত কী। (জোড়াসাঁকোর ধারে-৭ম পরিচ্ছেদ, পৃ ২০৩)

তিনি কল্পনাকে তুলির রেখায় রূপ দিয়েছেন, আর কালির লেখায় কত কাহিনিকে। তাঁর তুলিতে ছিল জাদু আর লেখাতে ছিল মধু।

দীর্ঘদিন ধরে প্রস্তুত ছিল মন। মাহেন্দ্রক্ষণের অপেক্ষায় থাকতে হয়েছিল। একদিন এল সেই অমৃতযোগ। পিতৃব্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (৭. ৫. ১৮৬১-৭.৮. ১৯৪১) বললেন, "তুমি লেখো না, যেমন করে তুমি মুখে গল্প কর, তেমনি করেই লেখো।" আমি ভাবলুম, বাপ রে, লেখা সে আমার দ্বারা কস্মিনকালেও হবে না। উনি বললেন, "তুমি লেখোই না; ভাষায় কিছু দোষ হয়, আমিই তো আছি।" সেই কথাতেই মনে জোর পেলুম। একদিন সাহস করে বসে গেলুম লিখতে। লিখলুম এক ঝোঁকে একদম শকুন্তলা বইখানা। লিখে নিয়ে গেলুম রবিকাকার কাছে, পড়লেন আগাগোড়া বইখানা, ভালো করে পড়লেন। শুধু একটি কথা 'পল্বলের জল' ওই একটিমাত্র কথা লিখেছিলাম সংস্কৃতে। কথাটা কাটতে গিয়ে 'না থাক্' বলে রেখে দিলেন। আমি ভাবলুম, যাঃ। সেই প্রথম জানলুম, আমার বাংলা বই লেখার

ক্ষমতা আছে। এত যে অজ্ঞতার ভিতরে ছিলুম, তা থেকে বাইরে বেরিয়ে এলুম। মনে বড় স্ফূর্তি হল, নিজের উপর মস্ত বিশ্বাস এল। তারপর পটাপট করে লিখে যেতে লাগলুম— 'ক্ষীরের পুতুল', 'রাজকাহিনী', ইত্যাদি। সেই যে উনি সেদিন বলেছিলেন 'ভয় কী, আমি তো আছি' সেই জোরেই আমার গল্প লেখার দিকটা খুলে গেল। (জোড়াসাঁকোর ধারে। ১৭শ পরিচ্ছেদ, পৃ ২৬৫)

সেকালে শিশুদের পাঠযোগ্য বই ছিল না। রবীন্দ্রনাথ— অবনীন্দ্রনাথকে নিয়ে পরিকল্পনা করলেন বাল্য গ্রন্থাবলী সিরিজ বের করবেন। অবনীন্দ্রনাথ পড়লেন ফাঁপরে। তিনি লিখছেন— 'আমি ভয় পেয়ে গেলুম। কারণ ওসব আমার আসেনা। সেকথা অন্য লেখায় আগেই বলেছি। কিন্তু আপত্তি টিকল না। আমার ওপর ভার পড়ল শকুন্তলা লেখবার। আমি লিখলুম শকুন্তলা, ক্ষীরের পুতুল, আর রবিকাকা একখানি ছোট কবিতার বই 'নদী'— ওখানা যে ছোটদের জন্য, ওতে লেখা নাই বটে, কিন্তু ওটা বালকদের জন্যই লেখা।

এই প্রসঙ্গে অবনীন্দ্র দৌহিত্র মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯.৮.১৯০৯-১৪.১.১৯৬৯) লিখছেন—

> শকুন্তলার মত করে অনুরূপ ভাষায় দুখানি বই লিখতে আরম্ভ করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। ঠিক জানা যায়নি, কোন্ তারিখে, তবে যতদূর মনে হয় শকুন্তলা লেখার দু-এক বছর আগেই। একখানি 'কৃষ্ণকথা' অপরখানি 'নলদময়ন্তী উপাখ্যান'। এই বই দুটি শেষ করেন নি। যেটুকু লিখেছিলেন তা পরে 'টুকরো কথা'য় ছাপানো হয়েছিল। (সাময়িক পত্রে প্রকাশিত অবনীন্দ্রনাথের রচনাপঞ্জি, বিশ্বভারতী পত্রিকা, সম্পাদক পুলিনবিহারী সেন, ষোড়শ বর্ষ, সংখ্যা ২-৩, কার্ত্তিক -চৈত্র ১৮৮১-৮২ শক, পৃ ২০৬)

দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণা দেবার আগেই অর্থাৎ 'শকুন্তলা' রচনার আগেই অবনীন্দ্রনাথ গল্প লেখক হয়েছিলেন। এই লেখা দুটি 'বিভাব' পত্রিকার অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০১, এবং জানুয়ারি-মার্চ ২০০২ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। যাক্ সে সব কথা, এখন 'আপন-কথায়' চলে আসি।

সাতটি ছোট ছোট স্মৃতিকথা নিয়ে তৈরি আপন-কথা। 'মনের কথা' একেবারে অবতরণিকা অংশ। কেন লিখছেন, কাদের জন্য লিখছেন— এসব কথা 'মনের কথা'তে আছে।

'পদ্মদাসী' দিয়ে শুরু। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দের জন্মাষ্টমীর দিন ১২টা ১১ মিনিটে যে ছেলেটি ভূমিষ্ঠ হয়েছে তার যখন জানবার বুঝবার বয়স হল তখন সে পদ্মদাসীর অধীন। এক রাত্তিরে পিদিমের আলোয় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে তাঁর পদ্মদাসী মস্ত একটা রূপোর ঝিনুক আর গরম দুধের বাটি নিয়ে বসে আছে। সেই গরম দুধ জোড়ানো হচ্ছে— দাসীর কালো হাত দুধ জুড়োবার ছন্দে উঠছে আর নামছে। এরপর সেই আধঠাণ্ডা দুধ কোনোরকমে গিলিয়ে খাটের ওপর তিনটে বালিশের

মাঝখানটায় কাত করে ফেলে, একখানি ঘুমপাড়ানী ছড়া আউড়ে সবুজ রং-এর মশারিটা গুঁজে দিয়ে চলে যেত। কোনো কোনো রাতে শিশুটির ঘুম ভেঙে গেলে শুনতে পেত পদ্মদাসীর কটকট শব্দে চালভাজা চিবানোর শব্দ আর তালপাতার পাখায় মশা তাড়ানোর শব্দ। শিশুটি জেগে আছে বুঝতে পারলে সে চুপি চুপি মশারি তুলে একটুখানি নারকেল নাড়ু তার মুখে গুঁজে দিত।

একেবারে রাতের অন্ধকারের মতো কালো ছিল তাঁর পদ্মদাসী। অন্ধকারে মিলিয়ে থাকত সে, দেখতে পাওয়া যেত না তাকে— শুধু মাঝে মাঝে তার ছোঁয়া অনুভব করতেন শিশুটি।

ঘুমের মধ্যে সেই শিশুটি অনুভব করতো একটা কঙ্কাকাটার— যার পেটটা থেকে থেকে অন্ধকারে ঢোক গেলে; যার চোখ নেই অথচ হাত দুটো যেন কাঁকড়ার দাঁড়ার মতো ও শেষে পরিষ্কার ভাবে দেখতে পেত তার শিকার। অনুভব করতো আর এক উপদেবতার অস্তিত্ব— সে নামত বিরাট এক আগুনের ভাটার মতো। সে আসত বাড়ির ছাদ ফুঁড়ে, আসত সরাসরি একেবারে শিশুটির বুকের ওপর। মাঝে মাঝে সে এগিয়ে আসত জ্বলন্ত একটা স্তনের মতো একেবারে মুখের কাছাকাছি এর ফলে চোখে মুখে লাগতো ঝাঁজ পরে আস্তে আস্তে ছেলেটাকে ছেড়ে চলে যেত। এরপরে আসত জ্বর। এদের কাছ থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য ওয়াড়সহ লাল শালুর লেপের মধ্যে ভয়ে কুঁকড়ে শুয়ে থাকত ছেলেটি। কোনো কোনো রাতে পদ্মদাসী ছেলেটিকে না পেয়ে চিৎকার করে উঠত। ছেলেটির সঙ্গে দশ-বারো বছর পর্যন্ত এ ব্যাপারগুলো চলছিল।

একদিন সকাল দেড় প্রহরের সময় তার কালো পদ্মদাসীর সঙ্গে 'রসো' নামের মোটাসোটা ফরসা চাকরাণীর মধ্যে বেঁধে যায় ঝগড়া। ঝগড়া থেকে শুরু হয়ে যায় হাতাহাতি। হঠাৎ দেখা গেল পদ্মদাসী একটা ধাক্কা খেয়ে ঠিকরে পড়ল দেওয়ালের ওপর। তখন তার কালো কপাল বেয়ে রক্ত ঝরছে, চুলগুলো উসকো খুসকো— তাকে দেখাচ্ছে সিদুর পরা কালো পাথরের একটা মুর্ত্তির মতো। তারপর ডাক্তার এসে একটা ছেঁড়া কাপড়ের সাদা পটি দাসীর কপালে বেঁধে দিয়ে গেল। তারপর সেই দাসী বাড়ী চলে যায় আর কখনো ফিরে আসেনি। এখানেই পদ্মদাসীর কথা শেষ। তবে মাঝে মধ্যে কখনো কখনো কোনো স্মৃতিকথায় উঠে এসেছে।

'আপনকথা'য় দ্বিতীয় বিষয় 'সাইক্লোন'। যে ছেলেটা তেতলায় কাটিয়েছে অনেকদিন, সাইক্লোনের সময় নেমে আসতে হল দোতলায়। সেদিনই মায়ের কাছে মেঝেতে শক্ত বিছানায় মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল। ঘুম এল না, বাইরে ঝোড়ো বাতাসের উদ্দাম নৃত্য, বৃষ্টির শব্দ, আর দুজন পিসি পান দোক্তা খেয়ে গল্প করছে আর এক আশ্বিনের ঝড়ের কথা। দোতলায় মাঝের ঘরে মাদুরে বসে দেখছে ছেলেটি মাথার ওপর সারি সারি ঝাড়, সাদা কাপড়ে মোড়া, দেয়ালে দেয়ালে দেয়াল গিরি। কত ছোটবড় অয়েলপেন্টিং, বাড়ির কর্তাদের। অপলক দৃষ্টিতে সে সব দেখে কিশোরটি।

শুধু তাই নয়, একটি ইংরেজি শব্দ শেখা হয়ে গেল— 'সাইক্লোন'। ও যার দৌলতে বাড়ির অনেকখানি জানাবোঝা হয়ে গেল। ছেলেটি যেন আর একটু বড় হয়ে গেল। আর সে যেন নতুন করে চিনে ফেলল দু'পিসেমশায়, দু'পিসিমা, বাবামশাই আর মাকেও। সে সময়ে ছেলেটির চোখে ফুটে উঠেছে এভাবে—

> কে যে আমাকে নামিয়ে আনলে, হাত ধরে টেনে হিঁচড়ে আনলে, কিম্বা কোলে করে নামিয়ে আনলে, তা মনে নেই। কেবল মাঝের ঘরটা মনে আছে। সেখানে সরাসরি বিছানা, কৌচ টেবিল সরিয়ে, মাদুরের উপর পেড়ে দিতে ব্যস্ত চাকর দাসীরা। হলদে রঙের বড়ো বড়ো কাঠের দরজা সারিসারি সব কটাই বন্ধ হয়ে গেছে। ঘরে বাতাস আসতে পারছে না, চাকরানীগুলো দুধের বাটি জলের ঘাটি, পানের বাটা, পিতলের ডাবর ঝনঝন করে ফেলে ফেলে জমা করছে ঘরের কোণে।

সেই ঝড়ের ধাক্কায় সেই বিরাট বাড়িটার অনেকখানি, বাড়ির মানুষদের অনেকখানি, আর ঝড়ই বা কি, 'সাইক্লোন' কাকে বলে সব জানা হয়ে গেল। অভিজ্ঞতায় অনেকটাই বড়ো হয়ে গেল ছেলেটি।

এর পরে এসেছে 'উত্তরের ঘর'।

বাড়িটির দক্ষিণদিকে ফুলবাগান, গাছপালা আর মেঁহেদির গড়া সবুজ চক্কর। সে বাগানে দুপুরে ওড়ে প্রজাপতি, ঝোপে ডাকে ঘুঘু, আর কাঠঠোক্রা মাঝে মাঝে দেয় জানান। ময়ূর বেড়ায় পাখনা মেলিয়ে, রাজহংসদের সাঁতার, বাদলের দিনে সারসের নাচ, ঝড়-বাতাসে দোল খাওয়া নারকেল গাছের সারি, সন্ধ্যায় দেখা দেয় তারা নীল আকাশের, রাতে ডাকে পাপিয়া, কতদূর থেকে কোকিল তার জবাব দেয়— পিউ পিউ, কিউ কিউ। রাতে ডাকে শেয়াল, বর্ষায় ব্যাঙের ডাক। এমনি আরও কত কিছু।

তবে এদিকটা দেখা বা খোলা নিষিদ্ধ। তেতলার টানা বারান্দার বন্ধ ঝিলমিল দিয়ে ওদিকের আভাষ একটু আধটু পাওয়া যেত। কারণ এ জায়গাটা তৈরি হয়েছিল বৈঠকখানা হিসেবে। এই বৈঠকখানাকে বসতবাড়ি হিসাবে গড়ে তুলতে দিতে হয়েছিল অনেক পর্দা। আর তা না হলে ঘরের আব্রু থাকে না। পর্দা, দেওয়াল প্রভৃতির সঙ্গে কয়েকটি জানলা দরজাও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। বন্ধ থাকত দক্ষিণের তিনতলার ঝিলমিল, ভোর থেকে রাত দশটা পর্যন্ত।

খড়খড়ি দিয়ে দেখা যেত অদূরে চলমান জীবনের ছবি। কত চরিত্রের, কত ঢং-এর, কত সাজের মানুষ, গাড়ি ঘোড়া, মানুষ, পশু— সবই দেখা যেত। চোখে পড়ত ছাগল, মুরগি, হাঁস, খাটিয়া, বিচালির গাদা— আরও কত কিছু। বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে দেখতো ছেলেটি। দেখা যেত গাড়িঘোড়া, সহিস, কোচম্যান, উড়ে বেহারা, গোমস্তা, মুহুরী, চৌকিদার, ডাক পেয়াদা, ছিরু মেথর, নন্দ ফরাস, গোবিন্দ খাঁড়া, বুড়ো জমাদার, ভিস্তি, মুটে প্রভৃতির ছবি। সবাইকে নিয়ে যেন একটা যাত্রা চলছে সারাদিনমান ধরে।

তখনো বাড়িতে বাড়িতে কলের জল আসেনি। জল যোগান দিত ভিস্তিওয়ালা ভিস্তিতে করে। রোজই দেখা যেত একটা ভিস্তিকে। গায়ে তার হাতকাটা নীলজামা, কোমরে খানিক লালশালু জড়ানো, মাথায় পোস্ট অফিসের গম্বুজের মতো শাদা টুপি— নহরের পাশে দাঁড়িয়ে চামড়ার মোষোকে জল ভরে। মোষকালো চামড়ার মোষোকটা ঘাড় তুলে হাঁ করে জল খায়, যেন একটা জলজন্তু; পেটটা তার ক্রমেই ফুলতে ফুলতে চকচক করতে থাকে।'— ছোট ছেলেটির কাছে— "সে যেন একটা সনাতন জীবের মতো তখনো ছিল এখনো আছে।"

ভিস্তিওয়ালা চলে যাবার পর দেখা যেত শ্রীরাম ডোমকে। লোকে তাকে 'ছিরে ডোম' বলে ডাকত। শিল্পীদের ছবি আঁকার জন্য যেমন নানা রকমের তুলি থাকে, তেমনি 'ছীরে' ডোমের থাকত নানাধরনের কাঁটা। সেগুলি দিয়ে সে রাস্তা, নর্দমা, প্রভৃতি পরিষ্কার করত। কথকের দৃষ্টিতে,

> আমাদের হীরে মেথরও কাছে রাখত রকম বেরকম ঝাঁটা। রাস্তার ঝাঁটা ছিল তার কলমের মতো ডগার একধারে ছোলা; জলের নর্দমা পরিষ্কার করবার জন্য রাখত সে দাড়ি কামানো বুরুশের মতো ছোটো এবং মুড়ো ঝাঁটা; বাগানের পাতালতা কুটো কাটা ঝাঁটানোর জন্য ছিল চোঁচের মত খোঁচা দুফাঁক ঝাঁটা। যাতে সামান্য কুটোটিও ঝুড়িতে তুলে নেওয়া চলে অনায়াসে; উঠোন, দালান, বারান্দা ঝাঁটানোর ঝাঁটা ছিল চামরের মতো হালকা ফুরফুরে, বাতাসের মত হালকা পরশ বুলিয়ে চলত মেঝের উপরে। এই নানারকম ঝাঁটার খেলা খেলিয়ে চলে যেত সে রোজই।

এরপর দেখতে পাওয়া যেত একটা ছোট্ট টাট্টু ঘোড়ার গাড়ীতে চেপে এক মোটা সোটা গম্ভীর, মাথার চুল যার কদম ফুলের মতো ছাঁটা, ছাতিটা বন্ধ করে দেউড়িতে ঢুকে পড়ে। ঘণ্টা বাজে এবার সাতবার, তারপর খানিক ঢং ঢং করে টান দিয়ে সাড়ে সাতটা বুঝিয়ে থামে।

একেবারে দুপুরবেলা যখন নিঝুমের খেলা চলে, তখন উত্তরের আঙিনায় পশ্চিম কোণে আধখানা তেঁতুল আর আধখানা বাদাম গাছের ছাওয়াতে খোলার ঘরটা— ঘরের চাল যার ধনুকের মত বেঁকে প্রায় মাটি ছুঁয়েছে। ঘরের মাঝখানে আধখানা মাটিতে পাতা মস্ত একটা মেটে জালা, তাই থেকে ছীরে মেথর জল তুলে গা ধুচ্ছে আর ক্রমান্বয়ে ইংরেজিতে নিজের বৌকে গাল পাড়ছে আর বৌটাও বাংলায় গালি পাড়ছে অবিরত।

বেলা চারটে পর্যন্ত এই নিঝুমের খেলা চলে। একটার পর একটা স্কুল গাড়ি, আফিস গাড়ি, পালকি এসে দলে দলে সওয়ারি নামিয়ে চলে। আসতেন গোবিন্দ খোঁড়া, রাজেন মল্লিকের ওখানে প্রতিদিন পাত পড়ত, বিকেলে সামনের গোল চক্করটাতে এসে হাওয়া খেতে বসত। বহুকালের পুরনো আঁকাবাঁকা গাছের ডালের মতো শক্ত তার চেহারা, বাইবেল কি আরব্য উপন্যাসের কোনো চরিত্রের মত।

গোলবাগানের ফটকের উপর একপিলপেই ঠেস দিয়ে প্রতিদিন সে বসত। ঐ সিংহাসনে কারুর বসবার জো ছিল না। পাহারাওয়ালা, কাবুলিওয়ালা, জমাদার, সরকার, চাকর, দাসী— সবাইর সঙ্গে ছিল তার আলাপ— আবার সবাই তাকে সমীহ করে চলত। শহর ঘোরা সে যেন এক চলতি খবরের কাগজ বা কলকাতা গেজেট। ঐখানে বসে সে নানা খবর বিলোত। চালচুলো না থাকলে কি হবে, রেস্ত ছিল তার যথেষ্ট। প্রথমবার প্রিন্স আসবার সময় পুলিশকে তেল বিলিয়ে গরীবদের ঘরেও পিদিমের ব্যবস্থা করেছিল।

গোবিন্দ খোঁড়ার দরবার ছিল গোল চক্করের পাঁচিলে আর অন্যদিকে সমসের কোচম্যানের মজলিশ ছিল দড়ির খাটিয়া পেতে। ফরসি হাতে তাকে দেখাতো দ্বিতীয় টিপু সুলতানের মতো। হাবসির মতো কালো রং, বাবরিকাটা মাথার চুল, পরনে শাদা লুঙি, হাতকাটা মেরজাই, চোখে সুর্মা, মেদিতে লাল মুচড়ানো গোঁফ, সিঁথেকাটা দাড়ি। ছেলেটির বাবা অর্থাৎ বাবামশাই (গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর) কে হাওয়া খেতে নিয়ে যাবার সময় সে নিজেই সাজত জমকালো ভাবে।

> চুড়িদার পাজামা, রূপোলি বকলস দেওয়া বার্নিশ জুতো, আঙুলে রূপোবাঁধা ফিরোজার আংটি, গায়ে জরিপাড়ের লাল বনাতের বুক কাটা কাবা তকমা আঁটা, কাঁধে ফুলকাটা রুমাল, মাথায় থালার মতো মস্ত একটা শামলা,... কোমরে লম্বা সাপের মতো জরির কোমরবন্ধ।

এভাবে সেজে সমসের লাল চক্করের পাঁচিলে চাবুক হাতে দাঁড়াত আর সহিস সাদা ঘোড়া দুটোকে প্রায় মিনিট দশেক সার্কাসের ঘোড়ার মতো চক্কর দিয়ে তবে গাড়িতে জোতার নিয়ম ছিল। এই দুর্দান্ত কোচম্যান, ঘোড়াও তার তেমনি, গাড়িখানা নিয়ে ঝড়ের মতো বেরিয়ে যেত। আর আতর গোলাপের খুশবুতে কিছুক্ষণ ম ম করতো উত্তরের দিকটা।

এরই কিছুক্ষণ পরে নন্দ ফরাশ দুহাতে আঙুলের ফাঁকে বড় বড় তেলবাতির সেজ দুটো ভারি অদ্ভুত কৌশলে হাতের চেটোতে অটলভাবে বসিয়ে উঠে চলত ফরাশখানা থেকে বৈঠকখানায়। এরপর নেটো খোঁড়া ও নন্দ ফরাশ দুয়ে মিলে বেহালার বাদন শুনিয়ে সেদিনের মত দিন শেষ হত। এরপর রাতে পিদিমের কাছে রূপকথা শোনা। ইকড়ি মিকড়ি ও ঘুঁটে খেলা আরম্ভ হত।

রূপকথা বলত মঞ্জরী নামের এক দাসী। সে দাসীটা ছেলেটির ছোটবোন অর্থাৎ সুনয়নীর দাসী। তার নামের ডগাটা ছাঁটা হয়ে গিয়েছিল। ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে সে বলত নানা রূপকথা।

ছেলেটির মা ছিলেন সুহাসিনী। তাঁর ছিল অনেকগুলি দাসী সৌরভী, মঞ্জরী, কামিনী প্রভৃতি কত নাম। এঁরা সব গাঁয়ের মেয়ে— অনেকদিন পর পর দেশে যেত। এরা দল বেঁধে গঙ্গায় নাইতে যেত, আর পার্বণীর মেলা থেকে কিনে আনত হরেক ধরনের খেলনা। পীরের ঘোড়া, সবজে টিয়ে, কাঠের পালকি, মাটির জগন্নাথ,

সোনার ময়ুর ঢেঁকি, বঁটি প্রভৃতি।

এক একদিন মঞ্জরী দাসী নিজের খেয়ালমতো খোলা জানালার কাছে তুলে নিয়ে দেখাত মামার বাড়ি। ছেলেটি প্রায় কিছুই দেখতে পেতো না। তার চোখে পড়ত 'বাড়ির উত্তর পশ্চিম কোণে মস্ত তেঁতুল গাছটার শিয়রে মন্দিরের চুড়োর মতো শাদা শাদা মেঘ স্থির হয়ে আছে।' ঐটুকু দেখিয়েই সে কোল থেকে নামিয়ে দিত ছেলেটিকে। এরপর সে দরজা-জানালা সব বন্ধ করে দিয়ে রান্নাবাড়িতে ভাত খেতে যেত সিন্দুকের পাশ থেকে একটি বগি থালা তুলে নিয়ে।

দিন দুপুরে ঘরখানা অন্ধকার হয়ে যেত। খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে কিছুটা আলো, বাতাস আসত, আর আকাশের দিক থেকে ভেসে আসত চিলের ডাক। দুপুরের সেই আবছা অন্ধকারে চোখ দুটো অনেক কিছুই খুঁজত। চোখ চলে যেত তক্তার নীচে, সিঁড়ির সার্সির ফাঁকে, আয়নার উলটো পিঠে আর আলমারির চালের দিকে।

তার অনেকদিন পরে তিনতলার সারা দেওয়াল, ছবি, সিঁড়ি, তক্তা, আলমারি, ফুলদানি, মেঝের মস্ত জাজিম, বাড়িতে ঝোলানো পাখা প্রভৃতির সঙ্গে আলাপ হল ছেলেটির। উত্তরে সরু একফালি দেওয়ালে ঝোলানো থাকত একটা আলমারি— শুধু ওষুধ থাকত তার মধ্যে। আর এই আলমারির চালেই বসানো ছিল একটি হলদে মাটির নাড়ুগোপাল। সে যেন হামাগুড়ি দিতে দিতে হঠাৎ থেমে গিয়ে ডান হাতের মস্ত নাড়ুটা এগিয়ে দিয়ে চেয়ে আছে ছেলেটির দিকে। চোখ আর সরে না কিছুতেই। দেখে যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। এই গোপালের পাশে একটি নীল সরু গলার কাঁচের বোতল যার গায়ে রাঙা, হলুদ, কালো ও সাদা রংয়ের টিকিট সাঁটা।

এরপর ছেলেটি তার মায়ের ঘরের কথা বলেছে। এ ঘরে ছিল একটি টেবিল ও চৌকি। এই ঘরটার পুবদিকের দরজার কাছে একেবারে কাঁচের মত পিছল কালো বার্নিশ মাখানো একটা পায়ে দাঁড়ায়ে একটি বাদামী টেবিল। এই টেবিলটার নীচে ছিল একটা কল, সেটাতে জোরে টান দিলেই টেবিলের ওপরটা কাত হয়ে যেত ও পড়ে যেত বই, কাগজ, সেলাইয়ের বাক্স, উলবোনার কাঠি প্রভৃতি। এর পাশেই শুয়ে থাকত একটা সরু একজোড়া ইটালিয়ান কুকুর, যাদের খাদ্য ছিল পাউরুটি, বিস্কুট আর মুরগির ডিম। মুরগির ডিম দেখে লোভ জাগত ছেলেটির। একদিন লুকিয়ে টেবিলের নিচে পড়ে থাকা ডিমের খোসাটা চিবিয়ে খাবার সময় হাতে নাতে ধরা পড়ে যায় ছেলেটি। সবার কাছ থেকে জুটল অনেক তিরস্কার আর বাবার কাছে পেল শাস্তি। হাইড্রোফোবিয়া হবার ভয়ে নীলমাধব ডাক্তার পরীক্ষা করে গেলেন আর বাবা শাস্তি দিলেন এক ঘণ্টা দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকার।

বড় রাগ হল ছেলেটির। ফন্দি আঁটতে থাকে মনে মনে কি করে ঐ কুকুর দুটোকে মেরে ফেলা যায়। মস্ত গালচের দিকে চেয়ে চেয়ে নানা ফন্দি সে আঁটতে থাকে। এরপর মন চলে যায় গালচের দিকে যেটা 'বড়ো বড়ো সবজে পাতা আর সাদা ধুতরো ফুল, কালো জমির ওপর বোনা'। আর আছে গোপাল পালের গড়া লক্ষী

আর সরস্বতী— ছোট্ট ছোট্ট আসল মানুষের মতো রঙ করা কাপড় পরানো। এই খেলনা দেবতার কাছেই ছিল 'চওড়া গিলটির ফ্রেমে বাঁধানো, তেল রঙ করা বিলিতী একটা মেমের ছবি।' তার চুল কালো, কিন্তু কটা নয়, মাথায় একটা কানঢাকা টুপি, পরনে খয়েরি মখমলের হাত কাটা জামা আর পরনে শাদা ঘাঘরা। তার বাঁহাতে একটি ঝুড়ি, রুমাল ঢাকা চুবড়ির মধ্য থেকে যেন একটা সত্যিকারের কাচের বোতল গলা বার করে আছে। সত্যিকার মস্ত একটা কুকুরের পিঠে মেয়েটি রেখেছে তার ডানহাত। কুকুরটা চেয়ে ঝুড়ির দিকে আর মেয়েটা কুকুরের দিকে। একেবারেই মনে হত না সেটা শুধুমাত্র ছবি।

ছেলেটির বাবামশায়ের শোবার ঘরটি সাজানো হচ্ছিল নতুন করে। সাহেব মিস্ত্রি লাল সাদা, কালো রঙের বিলাতি টালি কেটে কেটে মেঝেতে বসাচ্ছে। বাবার শোবার ঘরটা প্রায়ই তালাবন্ধ থাকত। সাজানোর পরে যখন খোলা হল দেখা গেল, 'সব কটা জানলা দরজার মাথায় মাথায় সোনার জল করা কার্নিস বসে গেছে, আর সেগুলো থেকে ফুটকাটা পর্দা জোড়া জোড়া ঝুলছে, সবজে আর সোনালী রেশমে পাকানো মোটা দড়ায় ফাঁসে লটকানো। ... ঘরটার পশ্চিমমুখো জানালাটা খুলে তার ওধারটাতে বানিয়েছে অক্ষয় সাহা ইঞ্জিনীয়ারবাবু একটা গাছঘর, কাঠ আর টিন আর ঘষা কাঁচের সার্সি দিয়ে।' তার দেওয়ালটা আগাগোড়া গাছের ছালের টুকরো দিয়ে মুড়ে ভাগবত মালি লটকে দিয়েছে সব বিলিতি দামী পরগাছা। এগুলোতে ফুলফল কিছুই নেই, কোনোটাতে পাতা নেই, আছে কেবল কাঁটা। ছোট ছেলেটির অনুভবে বাবার সদ্য সজ্জিত শোবার ঘরের কথা এভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে। এর পরের প্রসঙ্গ 'এ আমল সে আমল'।

এই পরিচ্ছেদটা শুরু হয়েছে রামলাল কুণ্ডুকে দিয়ে— যে এখন ছেলেটির নবনিযুক্ত চাকর। তার নাম সে নিজে বলত 'ছী আমলাল কুণ্ডু'। রামলাল ছিল ছোটকর্তা অর্থাৎ রমানাথ ঠাকুরের কাছে। তাঁর নানা ফরমাস খাটত সে। ঘুমের আগে ছোটকর্তার পায়ে সুড়সুড়ি না দিলে কিছুতেই তাঁর ঘুম আসতো না। ছোটকর্তা সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত এক্কেবারে ধরাবাঁধা নিয়মে চলতেন, একটু ব্যত্যয় হবার উপায় ছিল না। একটু এদিক ওদিক হলে তাঁর মেজাজ যেত বিগড়ে। এর ফলে দেখা দিত অনিদ্রা, বুক ধরফড়— প্রভৃতি নানা ধরনের উপদ্রব। চাকরদের ব্যাপারটা বুঝে চলতে হত, না হলেই সঙ্গে সঙ্গে বরখাস্ত। এভাবে বরখাস্ত হয়েই রামলাল আমার একেবারে নিজস্ব চাকর হিসেবে কাজে লেগেছিল।

সেকালের বড় বড় পাথরের গোল টেবিলের বাঁকা পায়াগুলো কিছুতেই তিনি সহ্য করতে পারতেন না। তাই টেবিলের পায়াগুলোতে কাপড় জড়ানো থাকত। বাতাসে কোনোরকম ভাবে জড়িয়ে দেওয়া কাপড় সরে না যায়, সেদিকে চাকরদের সদাসর্বদা নজর রাখতে হত। প্রথম টানেই যাতে মটকা থেকে ধোঁয়া পাওয়া যায়— এজন্য হুঁকোবরদারকে যথেষ্ট সজাগ থাকতে হোত। ছোটোকর্তার পা না টিপে দিলে

আসতো না ঘুম, যে চাকরটি কর্তার পা টিপবে তার হাত নরম হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাই নরম হাতওয়ালা চাকরকে এ কাজে নিযুক্ত করা হত। ঘুমের আগে গল্প শোনানো, সকালে খবরকাগজ পড়ে শোনানো, আচমনের জল দেবার জন্য পৃথক চাকর। আবার তোপ পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ছোটকর্তা একবার হাঁচবেন, যদি হাঁচি ঐ সময় না আসে, তবে ডাক্তারকে তখনই তলব করতে হবে।

এ সমস্ত কাজের কোনো একটায় অসুবিধা হওয়ায় রামলাল ছাঁটাই হয় ছোটবাবুর কাছ থেকে এবং আশ্রয় গেল সেই ছেলেটির কাছে। গোটাবাড়িতে থাম, অনেক দরজা, অনেক কড়ি-বরগা, লোহার রেলিং আর পাঁচিল ঘেরা জায়গায় একটি মাত্র ছোট্ট ছেলে অবনঠাকুর।

এক এক সময় জানালাগুলো খুলে দেওয়া হয়, আসে বাইরের অজস্র আলো বাতাস— সেগুলো বন্ধ হলেই আবার সেই অন্ধকার। এভাবে শুধু খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে দিন কাটে। মাঝে মাঝে দাসীদের ফিসফাস আওয়াজ শোনা যায়। বিষয় মনিবদের গালাগালি। ঘরটা কেমন কেমন ফাঁকা ভাব জাগায়। কল্পনার বিষয়বস্তুও নেই।

সেই ছেলেটির একান্ত ব্যক্তিগত চাকর রামলাল [১] আসায় নিজের মধ্যে সম্ভ্রমবোধ জাগে, নিজেকে ছোটকর্তা বলে মনে হয় ও বাড়ির আদবকায়দাতে দোরস্ত হয়ে ওঠার পালা শুরু হল। বাইরের মানুষজনের সঙ্গে ধীরে ধীরে পরিচয় হল। রামলাল লেগে গেল বাড়ির দ্বিতীয় একজন ছোট কর্তা তৈরি করতে। ছোটকর্তার মত ছুরি-কাঁটাতে খাওয়ার তালিমও শুরু করে দিল রামলাল। জাহাজে করে ভবিষ্যতে বিলেত যেতে হতে পারে এই ভেবেই রামলাল ইংরেজি তালিম দিতে আরম্ভ করল— শুরু হল ইয়েস -নো, বেরি-ওয়েল, টেক না টেক মজার কত কথা।

তিনতলার সেই ছোট ঘরটায় রামলালের শিশতন্ত্রে কাটত সময়। কখনো শুয়ে কখনো বসে, আর ওপরে কড়ি-কাঠের দিকে তাকিয়ে সময় কাটত। 'সেকালের ঝাড় ঝুলানোর মস্ত হুকগুলো কিম্বাচক চিহ্নে চেয়ে দেখত রামলালকে আমাকে মেঝের উপর সেই ঘরে।' পরের প্রসঙ্গ 'এবাড়ি ও বাড়ি'।

রামলাল আসার পর থেকে অন্দরের ধরাধরি থেকে ছাড় পেলেন ছেলেটি। বাড়ির একতলা, দোতলার সঙ্গে পরিচয় হল। পাশের বাড়িতেও যাতায়াত শুরু হয়েছে। প্রত্যেকের পায়ের শব্দ প্রায় চেনা হয়ে গেছে। জুতো, খড়ম, খালি পা —নানাজনে নানা রকম শব্দ দেয়। ছেলেটির বাবামশায় পরতেন লাল চটি আর চলার সময় শব্দ হোত না তার।

ভোর চারটের সময় চোখ তখনো বোজা, কানে নানা ধরনের শব্দ ভেসে আসত ছেলেটির কানে। শব্দ শুনেই বুঝতে পারতেন সহিস ঘোড়ার গা মলতে শুরু করেছে। শোনা যেত অন্ধ ভিখারীর শাক্ত সঙ্গীত— 'উমা গো, মা তুমি জগতের মা, ওমা কি জন্যে তুমি আমায় মা বলেছো'। আর সন্ধেবেলায় খিড়কির দুয়ারে একটা মানুষ

১। এই রামলালের একটি চিত্র তিনি এঁকেছিলেন।

এসে হাঁক দেয় মুশকিল আসান'। যার পাকাদাড়ি, লম্বা টুপি, ঝাপ্পাঝোপ্পা কাপড় পরা ভুতুড়ে চেহারা একটি মানুষ সামনে এসে দাঁড়াত। ভয়ে হাত পা কুঁকড়ে যেত। বিকেল তিনটেয় ফেরিওয়ালার ডাক ভেসে আসত— 'চুড়ি চাই, খেলোনা চাই' তার কাছে থাকত রঙিন কাঁচের ফুলদান, গোছাবাঁধা চুড়ি আর চিনে মাটির কুকুর বেড়াল। এখন শহর থেকে ছেড়ে পালিয়েছে বরফওয়ালার ডাক, আর ফুলমালির হাঁক। তার জায়গায় এসেছে মোটরের ভেঁপু, ট্রাম-গাড়ির হুশ-হাঁশ, টেলিফোনের ঘন্টা।

পাশের বাড়ি থেকে আসত পেটা ঘড়ির শব্দ। সকালে উপরি উপরি ছটা সাতটা, সাড়ে সাতটা বাজিয়ে ঘড়িটা বিরাম দিত। এরপর আটটা নটা দুঘন্টা ফাঁক ফের উপরো-উপরি দশ আর সাড়ে দশ বাজিয়ে ঘড়িটা যেন বিশ্রাম নিত। আবার বিকেলে বাজত ৪টা ও ৫টার সময়। কেন এইসব নির্দিষ্ট সময়ে বাজত— তার কারণ বলা হয়েছে এভাবে—

> সকালের ঘড়ি ঘুম ভাঙাবার জন্যে, সাতটার ঘড়ি উপাসনার জন্যে, সাড়ে সাত হল মাস্টার আসার আর পড়তে যাবার ঘড়ি। দশ স্নানাহারের; সাড়ে দশ ইস্কুল ও আপিসের; চার বৈকালিক জলযোগের, কাজকর্ম ও কাছারি বন্ধের; পাঁচ হাওয়া খেতে যাবার। রাতে ঘুমুতে যাবার ঘন্টা বাজত না। তবে ঠিক ন'টায় রাত্রে কেল্লা থেকে তোপ দাগা হত, আর আমাদের বৈঠকখানায় ঈশ্বরদাদা ব্যোমকালী বলে একটা হুঙ্কার দিতেন তাতেই পেটা ঘড়ির কাজ হয়ে যেত। বেলা একটার সময় করকর ঘরগর শব্দে ঘড়ির চাবি দেবার ধুম পড়ে যেত। এই ঘড়ির নিয়মেই গাড়ি ঘোড়া, চাকরবাকর, ছেলেমেয়ে সবাই চলে, হাঁড়ি চড়ে আর হাঁড়ি নামে, আর মাস্টারমশাই বই খোলেন ও বই বন্ধ করেন।

এক এক সময় মনে হোত ছেলেটির ওই পেটা ঘড়িটাকে একবার বাজাই। পুরনো বাড়ির উঠানের দাওয়ায় ঝোলান থাকত পেটা ঘড়িটা। শোভারাম জমাদার সেই পেটা ঘড়ির মালিক। সেই দাওয়ায় বসে সে ময়দা ঠাসত আর দুহাতের চাপড়ে এক একখানা মোটা রুটি ফসফস করে গড়ে তুলত। আর পেটা ঘড়িটা বাজাবার সময় হলেই মস্ত একটা কাঠের হাতুড়ি দিয়ে ঘা-কয়েক পিটুনি কশিয়েই আবার নিজের কাজে লেগে গেল। ছেলেটির সেই পেটা ঘড়িটা বাজাবার শখ জাগে। যেই না হাতুড়িতে হাত দেওয়া তেমনি শোভারাম গর্জে উঠল 'নেই কর্তা খাপ্পা হোয়েঙ্গা'।

কর্তামহারাজ, কর্তাদাদামশায় কে তা জানবার খুব আগ্রহ জন্মাত ছেলেটির। কর্তাদাদামশায় থাকেন দোতলার বৈঠকখানায়। তাঁর ঘরের সামনে থাকত পাহারায় কিনু সিং হরকরা। তার উর্দির বুকে 'ওয়ার্কস উইল উইন' আর হাতির পিঠে নিশেন চড়ানো তক্‌মা ঝুলানো। মোটা একটা রূপোর সোঁটা হাতে টুলে বসে পাহারা দেয়। আর হাতে থাকত পেন্সিল কাটা একটা ছুরি— তাই কর্তাকে সহজে দেখার উপায় ছিল না। এই কর্তামহারাজ, কর্তাদাদামশায় হলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।

কর্তামশায় বাড়িতে থাকতেন না বেশি। পাহাড় থেকে এসে যে কদিন বাড়ি

থাকতেন সে ক'দিন সব চুপচাপ। দরোয়ান, বাবামশায়, পিসিপিসে, এ-বাড়ি ও-বাড়ি সবাই যেন তটস্থ। চাকর চাকরানীদের চেঁচামেচি ঝগড়াঝাটি সব বন্ধ, আর সবাই ফিটফাট হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বৈঠকখানায় গানের মজলিস চলছে ধীরে ধীরে, কাছারি বসছে নিয়মিত ১০টা থেকে ৪টে, বিলিয়ার্ড রুমে কেদার দাদার হাঁকডাক একেবারেই বন্ধ। যাতে কোথাও কোনো গোলমাল সেদিকে সবার কড়া নজর। শুধু তাই নয় সবাইকে ফিটফাট হয়ে থাকতে হবে, আর বুড়ো খানসামা গোবিন্দ কর্তার জন্য ভোরে দুধ আনতে চলে যায়। যাইহোক কর্তা বাড়ি এলে বাড়ির ঘুমন্ত ভাবটা যেন কেটে যায় আর কর্তা চলে যাবার পর আবার সেই ঢিলেঢালা অবস্থা। তাই কর্তার গাড়ি ফটক পেরিয়ে যাওয়া মাত্র, ইস্কুল থেকে ছুটি পাওয়া গোছের হয়ে পড়ত বাড়ির এবং বাড়ির সকলের ভাবটা।

যেবার কর্তামশায় বাড়ি থাকতেন সেবার মাঘোৎসব পর্বটা বেশ জাঁকিয়ে হত। একবার হায়দারাবাদ থেকে মৌনাবক্স এসেছিল জলতরঙ্গ বাজনা বাজাবার জন্য। সকাল থেকেই বাড়িটা গাঁদা ফুল, দেবদারু পাতায়, সাজানো হত। লাল বনাত, ঝাড়লণ্ঠন ও গাড়ি ঘোড়াতে গিসগিস করত। তবে গান বাজনা, লোকের ভিড়, ঝাড়লণ্ঠন ছাড়িয়ে কর্তাদিদিমার দেওয়া গরম গরম লুচি, ছোঁকা, সন্দেশ, মেঠাই-দানা, ঢের ভালো লাগত ছেলেটির কাছে। প্রায় পনেরো আনা লোকই আসত মাঘোৎসবের ভোজ আর পোলাও মেঠাই খাওয়ার জন্য। মস্ত মস্ত মেঠাই কামানের গোলার মত, শেষ হয়ে যেত দেখতে দেখতে। পরের দিনও ছেলেদের জন্য মেঠাই আসত। মৌলা বাক্সোর গান শোনার জন্য খুব ইচ্ছে হচ্ছিল ছেলেটির। তাই ও বাড়ির পিসেমশায়ের কাছে তদ্‌বির করে ছেলেটি। তিনি 'দেখব দেখব' বলে বিদায় নিলেন। সারাদিন কেটে গেল কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

একরকম না যাওয়াই যখন স্থির হয়ে গেছে সে সময় রামলাল এসে খবর দিল আমাদের যাওয়ার হুকুম হয়েছে। তাড়াতাড়ি সাজগোজ করে বেরিয়ে গেল ছেলেটি। সেদিনের সেই স্মৃতি ধরা পড়েছে এভাবে—

> এই মাঘোৎসবে ভোজের বিরাট রকম আয়োজন হত তিনতলা থেকে একতলা। সকাল থেকে রাত একটা দুটো পর্যন্ত খাওয়ানো চলত।
>
> লোকের পর লোক, চেনা অচেনা, আত্মপর, যে আসছে, সে খেতে বসে যাচ্ছে। আহারের পর বেশ করে হাতমুখ ধুয়ে, গান কটা পকেটে লুকিয়ে নিয়ে, মুখ মুছতে মুছতে সরে পড়েছে— পাছে ধরা পড়ে অন্যের কাছে এরা সবাই। মাঘোৎসবের ভোজ আর মেঠাই, অনেকেই খেয়ে বাইরে গিয়ে খাওয়া দাওয়া ব্যাপারটার সম্পূর্ণ অস্বীকার করেও চলেছে এও আমি স্বকর্ণে শুনেছি, তখনকার লোকের মুখেও শুনতাম।

কর্তাদাদামশায়কে সামনাসামনি দেখার খুব ইচ্ছে ছেলেটির। হঠাৎ একদিন সুযোগও পেয়ে গেল। সকালবেলায় উত্তরের ফটকের রেলিংগুলোতে পা রেখে

যখন ঝুল দিচ্ছিল ছেলেটি— এমন সময় হঠাৎ কর্তামশায়ের গাড়ি এসে দাঁড়াল। পরনে লম্বা চাপকান, জোব্বা, পাগড়ি পরে কর্তা নামছেন দেখে দৌড়ে গিয়ে তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করে ফেললো ছেলেটি। কর্তামশায় ভারি নরম একখানা হাতে মাথাটাকে আমার ছুঁয়েই উপরে উঠে গেলেন। ময়লা জামাকাপড় পরে কর্তামশায়ের গেছে বলে ছেলেটি মার কাছ থেকে ধমক খেলে। আর রামলাল তখনই ছুটে এসে আমাকে পরিস্কার কাপড় পরিয়ে ছেড়ে দিলে। কর্তামশায় চীন দেশ থেকে ফিরলেন। তাই সবার জন্যে একটা একটা চীনের বার্ণিশ করা চমৎকার কৌটা এসে পড়ল, সঙ্গে গোটা কতক বীরভূমের গালার খেলনা। কৌটা ছিল রুহীতনের আকার আর উপরে একটা উড়ন্ত পাখি আঁকা। আর গালার খেলনাটা ছিল একটা মস্ত গোলাকার কচ্ছপ। মা আর দু'পসিমার জন্য এনেছিল হাতির দাঁতের নৌকা আর চীনদেশের সাততলা মন্দির। এই সুন্দর মন্দিরটার কি কারিগরিই ছিল। ছোট্ট ছোট্ট ঘন্টা ঝুলছে, হাতির দাঁতের উপরে হাতির দাঁতেরই গাছ, মানুষ জন সব দাঁতে তৈরি, এক একতলায় গম্ভীরভাবে যেন ওঠানামা করছে। পরে ঐ মন্দিরটা ছেলেটি ভেঙে ফেলে।

> কর্তামশায়কে তিনি আর একবার দেখেছিলেন পরিবারের কারুর একজনের বিয়েতে। ... বর চললে খড়খড়ি দেওয়া মস্ত পালকিতে, আগে ঢাকঢোল, পিছনে কর্ত্তাকে ঘিরে আত্মীয় বন্ধুবান্ধব, সঙ্গে অনেকগুলি হাতলণ্ঠন, আর নতুন রং করা কাপড় পরে চাকর দারোয়ান, পাইক। সদর ফটক পর্যন্ত কর্তা সঙ্গে গেলেন,তারপর বরের পালকি চলে গেছে কর্তামশায় উপরে চলে গেলেন— গায়ে লাল জামেওয়ার, পরনে গরদের ধুতি।

এবারের প্রসঙ্গ 'বারবাড়িতে'

একটু বয়স বাড়লে তখনকার রীতি অনুযায়ী দাসীদের কাছ থেকে চাকরেরা চার্জ বুঝে নিত। পদ্মদাসীর কাছ থেকে ছাড়া পেয়ে রামলাল চাকরের অধীন থাকতে হল। সে সময় ছেলেটির বাস ছিল তিনতলার উত্তরের ঘরে। সে সময় একবার সূর্যগ্রহণ ঘটে। থালায় জল রেখে সূর্যগ্রহণ দেখল ছেলেটি। সেই প্রথম ছাতে যাওয়া ও বিস্তৃত নীল আকাশ দেখার সুযোগ পেল ছেলেটি। আর দেখল তলায় একটি পুকুর আর দক্ষিণের বাগান।

এই দক্ষিণের বাগান ছিল বারবাড়ির সামিল— বাবুদের চলাফেরার স্থান। বর্তমানে যেমন সবাই অর্থাৎ চাকর বাকর দাস, দাসী এমনকি অন্দরের মেয়েরাও এই বাগান মাড়িয়ে চলাফেরা করে, সেকালের কিন্তু সেটি ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। এটি ছিল ছেলেটির বাবামশায়ের খুব সখের বাগান। সেখানে থাকত পোষা সারস ও ময়ুর। সারসগুলো হাঁটুজলে পুকুরে নেমে শিকার করত আর ময়ুরগুলো পেখম ছড়িয়ে ঘাসের ওপর চলা ফেরা করত। তিন চারটে মালি তাদের দেখভাল করত। একটি পাতা কি ফুল কারো ছেঁড়ার হুকুম ছিল না। বাগানে ছিল একটা মস্ত গাছ ঘর— সেখানে লাগানো ছিল দেশ বিদেশের নানারকমের গাছ। আর ছিল

পদ্মফুলের মতো একটি ফোয়ারা, তার জলে আফ্রিকা দেশ থেকে আনানো লাল মাছ খেলা করত আর নীল পদ্মপাতার তলায় খেলে বেড়াত। আর তিনতলায় বাড়ির প্রতিটি তলায় গাছ, পানি আর ফুলদানিতে ভরতি ছিল।

দোতলার দক্ষিণের বারান্দার পুব দিকে একটা মস্ত গামলায় লাল মাছ ঠাসা থাকত, তার পাশে দুটো শাদা খরগোশ, আর হাঁস ঘেরা মস্ত খাঁচার মধ্যে হাজারো পোষা পাখি, দেওয়ালে আঁটা একটা হরিণের শিঙের ওপর বসে লালঝুটি কাকাতুয়া, শিকলি বাঁধা চীনদেশের একটা কুকুর নাম — কামিনী। তার গা সবসময় পাউডার এসেন্সের গন্ধে ভরপুর থাকত।

ছেলেটির বাবা দুপুরের খাওয়ার পর ও বাড়ির কাছারিতে চলে গেলে ছেলেটি মাঝে মাঝে বৈঠকখানায় গিয়ে সময় কাটাতো। বৈঠকখানায় অনেক ধরনের পোষাপাখি ছিল— টুনি বলে একটা ফিরিঙ্গি ছোকরা প্রায় প্রতিদিন আসত পাখি চুরি করতে। খাঁচা থেকে পাখিটা উড়িয়ে সে জাল দিয়ে ধরে নিত। টুনি সাহেব একবার একটি দামী পাখি উড়িয়ে দিয়ে পালায়। দোষটি ছেলেটির ঘাড়ে চাপলে তখনি সে টুনির বিদ্যে ফাঁস করে দিয়ে রক্ষা পায়। আর একবার বারান্দায় গামলা ভর্ত্তি জলে পদ্মপাতায় নীচে লাল মাছগুলোর খেলা দেখতে দেখতে একটা দুর্বুদ্ধি মাথায় খেলে গেল ছেলেটির। ভাবল লাল রঙের জলে লাল মাছগুলো খেললে শোভা আরও বাড়বে। যেই ভাবা সেই কাজ। কোথা থেকে একটু লাল রং যোগাড় করে নিয়ে গামলার জলে ঢেলে দিতেই গামলার জল রাঙা হয়ে উঠল। ভারি মজা হল ছেলেটির। কিছু পরেই দেখা গেল দু'তিনটে মাছ মরে ভেসে উঠেছে। তা দেখেই একেবারে বারান্দা থেকেই চোঁচা দৌড়। মাছ মারার দায় থেকে কিভাবে ছেলেটি নিষ্কৃতি পেয়েছিল আজ আর তা মনে নেই। অনেকদিন পর্যন্ত দোতলায় নামতে সাহস পায়নি ছেলেটি।

আর একবার মিস্ত্রি হবার শখ মেটানোর ফলে কি বিপদে পড়েছিলেন তাও শুনিয়েছে ছোট ছেলেটি। চীনে মিস্ত্রীরা মনের মতো করে একটি পাখির ঘর তৈরি করছে— জাল দিয়ে ঘেরা যেন একটা মন্দির তৈরি হচ্ছে। সেই মিস্ত্রিদের মতো হাতুড়ি, পেরেক আরও যন্ত্রপাতি দেখে হাত নিসপিস করে। একদিন তারা যখন টিফিনে গেছে তখনি ছেলেটি একটা বাটালি আর হাতুড়ি নিয়ে মেরেছে দু তিন কোপ— অমনি হঠাৎ ফস করে পড়ল বাঁহাতের বুড়ো আঙুলের ডগায় বাটালির এক ঘা। নির্মীয়মান খাঁচাটির গায়ে লাগল দু-চার ফোঁটা রক্ত। সেই রক্তমাখা আঙুল নিয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে ছুটল নীচে বাগানে মাটি ও বালির প্রলেপ দিতে। রক্ত তো আর থামে না। শেষে দোষ স্বীকার সেবারের মতো রক্ষে পাওয়া। ধমক খেল মিস্ত্রিরা কেন তারা সাবধানে যন্ত্রপাতি রেখে যায়নি। হাতের কাটা এখনও ছেলেটির হাতে আছে।

অন্দরে বন্দি অবস্থায় যে ক'দিন তাঁকে থাকতে হত অধিকাংশ সময় কাটত ছোটপিসি কুমুদিনী দেবীর ঘরে। সে ঘরের দেওয়ালে টাঙানো থাকত শকুন্তলার ছবি,

মদন ভস্মের ছবি, উমার তপস্যার ছবি ও কৃষ্ণলীলার ছবি। দেওয়ালে টাঙানো এক একটি বিস্ময়মাখানো ছবি নিয়ে কেটে যেত দিনের পর দিন। ছবির মধ্যে যেন ঢুকে যেতেন তিনি। শুধু তাই নয় থাকতো জয়পুরী কারিগরদের আঁকা তৈরি ছবি, অয়েল পেন্টিং কালীঘাটের পট প্রভৃতি সবই তাঁর মনের মধ্যে গেঁথে যেত। ভবিষ্যতে শিল্পী হবার বীজ এখান থেকেই। তারপর ছিল এক আলমারি খেলনা ও বাংলা সাহিত্যের কিছু ভালো বই। ছোট পিসি সারাদিন পুঁতি গাঁথা আর সেলাই নিয়ে থাকতেন। আর তৈরি করতেন পুঁতির নানা অলঙ্কার। আরও কত কি কাজ করতেন তার ঠিক নেই।

ছোটো পিসি একজোড়া ছোট্ট বালা পুঁতি গেঁথে গেঁথে গড়েছিলেন— সোনালি পুঁতির উপরে ফিরোজার ফুল বসানো ছোট্টবালা দুগাছি সোনার বালার চেয়েও সুন্দর দেখতে।

ঘরের পাশেই খোলা ছাত। পায়রা পোষা ও পায়রাদের খাওয়ানোর খুব শখ ছিল। প্রতিদিন বিকেলে তিনি পায়রাদের খাওয়াতেন ছাতে। যেখানে যত পায়রা আছে ছাতে উড়ে আসত আর তাঁকে ডানায় ও পালকে ঘিরে ফেলত। যে এক মনোহর দৃশ্য। ছেলেটির বাবার ছিল দামি দামি পাখি, সারস ও ময়ূর পোষার শখ আর পিসিমার ছিল পায়রা পোষার শখ। সারা বছর ধরে নানা ধরনের পায়রা কিনছেন তিনি। চতুর লোকেরা তাকে ঠকিয়ে যেত নানাভাবে। একবার এক ফেরিওয়ালা পায়রার পালকে ময়ূরপুচ্ছ সেলাই করে দিয়ে পায়রাটাকে পিসির কাছে উচ্চমূল্যে বেচে গেল। ছেলেটির বাবা ধরিয়ে দিলেন তার ভুলটা।

ছোট পিসি কুমুদিনীর ছিল চারটে শখ— ঠাকুরপুজো, কথকতা শোনা, সেলাইফোঁড়াই আর পায়রাপোষা। একবার তাঁর তিনতলায় এক মেম এসে উপস্থিত হল তাদের ফটো নেবার জন্যে। সাজ সাজ পড়ে গেল। ছোট্ট ছেলেটিকে পরানো হল একটা হালকা নীলরং-এর কোটপ্যান্ট। সেটি পরামাত্র বোঝা গেল সেটি তার মাপে তৈরি হয়নি। যাইহোক সেই অদ্ভুত সাজ পরেই ছবি উঠে গেল। সে ছবি এখনও কারুর কারুর অ্যালবামে আছে।

ফটো তোলা আর বাড়ি তৈরির প্ল্যান করতেন ছেলেটির বাবামশাই। ড্রয়িং করার নানা সরঞ্জাম, কম্পাস পেন্সিল থাকত তার ঘরে। বাবামশায় কাছারি চলে গেছে ছেলেটি সেইঘরে নানা জিনিস নেড়েচেড়ে দেখতেন। সে সময় ফার্শী পড়াতে এক মুনশি এসে জুটতেন। সেই ফারশীর বয়েৎ পরিণত বয়স পর্যন্ত মনে ছিল ছেলেটির। আর আসতেন ডাক্তারবাবু ঠিক নটার সময়। অসুখ থাক বা না থাক তার হাজিরা ছিল নিয়মিত। রোগী না থাকলে তিনি তার বরাদ্দ মত পান-জল-তামাক খেয়ে বিদায় হতেন। শক্ত অসুখ হলে আসতেন বেলি সাহেব

প্রতিদিন ঘড়ি ধরে আসতেন ডাক্তার নীলমাধববাবু। তাঁকে ডাক্তার বলে মনেই

হত না। ছিলেন একেবারে ঘরের মানুষ ও মজার মানুষ। বাঘমুখো ছড়ি হাতে, গলায় চাদর ঝুলিয়ে, বুকে মোটা সোনার চেন,— ভালো মানুষের মতো এসে বসতেন একটা বেতের চৌকিতে। জ্বর হলে তিন দিন পর্যন্ত কোনো ওষুধ দিতেন না,— খেতে হত সাবুদানা, নয় এলাচদানা, বড় জোর কিটিং-এর বন্‌বন্‌। তিনদিন পরে জ্বর না ছাড়লে ডাক্তারখানা থেকে রেড মিক্সচার। গলদা চিংড়ির ঘি বলে মা সেটিকে পুরো খাইয়ে দিতেন।

এরপর ঠন্‌ঠনের চটি পায়ে চন্দ্র কবিরাজ। তিনি একেবারে— তোশাখানা থেকে দপ্তরখানা হয়ে লাল রঙের একটি বগলী (ছোট থলে) চটি (মকরধ্বজ) বিলি করে করে উঠে আসতেন তেতলার ঘরে। নাড়ি টিপে বেড়ানোই তার একমাত্র কাজ। এছাড়া উপরের ঘরে আসত আরও দুজন মানুষ। একজন হলেন গোবিন্দ পাণ্ডা ও অপরজন রাজকিষ্ট মিস্ত্রি। গোবিন্দপান্ডা আসত কামানো মাথায় নামাবলি জড়িয়ে, কর্পূরের মালা আর জগন্নাথের প্রসাদ নিয়ে। তাকে ঘিরে বসত সবাই। সে মেঝেতে খড়ি পেতে আগাম জানিয়ে দিত দাসীদের মধ্যে কার কপালে শ্রীক্ষেত্র দর্শন আছে। প্রসাদ বিতরণ করে সে শ্রীক্ষেত্রের পট দেখিয়ে দেখিয়ে অনেক গল্প করত।

রুবাধীয়ো বলে একজন সাহেব আসতেন। তিনি আসলে পর্তুগীজ ফিরিঙ্গি। গায়ের রং মিশকালো। বড় দিনের দিন সে একটা বড়ো কেক্‌ নিয়ে হাজির হত। আর আসতেন বৈকুণ্ঠবাবু। দেখতে ছোটখাটো মানুষটি মাথায় মস্ত টাক, রাজ্যের পাখি, গাছ আর নিলেমের জিনিস সংগ্রহে একেবারে ওস্তাদ ছিলেন তিনি। স্যার রিচার্ড টেম্পল তখন ছোটলাট। গাছের শখ বড্ড তাঁর। একবার নিলেমে বৈকুণ্ঠবাবু ছোটলাটের ওপর ডাক চড়িয়ে একটি বিদেশি গাছ গাছঘরে এনে হাজির করলেন। খবর পেয়েই ছোটলাট সোজা একেবারে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে। তিনি এখানকার বাগান দেখতে ইচ্ছা করেছেন। সবাই সেজেগুজে তাঁর সামনে হাজির হলেন। ছেলেটির মখমলের কোটপ্যান্ট আবার সিন্দুক থেকে বার হল। শুধু এক কাপ চা খেয়ে সাহেব বিদায় নিলেন সঙ্গে নিয়ে গেলেন নিলেমে ওঠা গাছটি। গাছটি চলে গেল জোড়াসাঁকো থেকে বেলডেভিয়ার পার্কে, সাহেবের বসতবাড়িতে।

বৈকুণ্ঠবাবুর বাসা ছিল পাথুরেঘাটায়, সেখান থেকে নিত্য হাজিরা দিতে আসতেন জোড়াসযাকোর বাড়িতে। একেবারে ছোটখাট মানুষটি একবার বড্ড বিপদে পড়েছিলেন। হঠাৎ বৃষ্টিতে রাস্তাঘাট ডুবে এক -কোমর জল দাঁড়িয়ে যায়। বৈকুণ্ঠবাবুর একেবারে ডুবুডুবু অবস্থা। পুকুর থেকে একটা নৌকা এনে বৈকুণ্ঠবাবুকে সে যাত্রায় উদ্ধার করা হয়। ছোট্ট মানুষটি হলেও বহুরকমের মতলব ঘুরত তাঁর মাথায়। একবার তাঁকে এক বাক্স নিব্‌ কিনবার কথা বলা হয়— তিনি এক গোরুর গাড়ির বোঝাই নিব্‌ কিনে হাজির হয়েছিলেন। এ ছাড়া বহু বিচিত্র শখ ছিল তাঁর।

এভাবে বহু মানুষের কথা উঠে এসেছে ছেলেটির পরিণত বয়সের স্মৃতিকথায়।

এবারের প্রসঙ্গ 'অসমাপিকা'

প্রথমেই ছেলেটির হাতে-খড়ির প্রসঙ্গ। উড়ো উড়োভাবে কানে আসছিল হাতে খড়ির কথা। কিন্তু একদিন হঠাৎ রামলাল রাত ৯টার আগেই ছেলেটিকে জানিয়ে দিল— 'ঘুমিয়ে নাও, সকালে হাতেখড়ি' ভোরে ওঠা চাই।'

অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম এলো না ছেলেটির। 'ভোরে ওঠা' আর 'হাতে খড়ি'— এ দুটি কথা অনেক রাত পর্যন্ত কানে বাজল। ঠাকুরঘরের বামুন আগে জানান দিয়ে গেল, আর রামলাল বললে— চলো আর দেরি নেই।'

আমাকে নিয়ে পা চালিয়ে চলল রামলাল। নানা গলি ঘুঁজি পেরিয়ে পৌঁছানো গেল ঠাকুরঘরে।' ঠাকুরঘরের দেওয়ালে সাদা পঙ্খের প্রলেপ; খ াটালে সারিসারি কুলুঙ্গি; তারই একটাতে তেল-কালি-পড়া পিলসুজে পিদিম জ্বলছে সকালবেলায়। ঠিক তারই নীচে দেওয়ালের গায়ে প্রায় মুছে গেছে এমন একটা বসুধারার ছোপ। ঘরের মেঝেয় একটি শাদা চুন মাখানো দেলকো আর আমপাতা; ডাব আর সিঁদুরমাখানো একটি ঘট। পুজোর সামগ্রী নিয়েই তার কাছে পুরুত বসে।' সেই ঘরেই গায়ে নামাবলি জড়িয়ে হরিনামে মালা হাতে বসে আছেন ছোটো পিসিমা। ধুপ-ধুনোর গন্ধে সব যেন ঘোলাটে হয়ে গেল। ছোট ছেলেটির চোখ জ্বালা করতে লাগল। তারপর কে যে সে মনে নেই, মেঝেতে একটা বড় ক লিখে দিলে। রামখড়ি হাতের মুঠোয় ধরে দাগা বুলোলেম — একবার, দু'বার, তিনবার। তার পরেই শাঁখ বাজল। হাতে খড়িও হয়ে গেল।

হাতে খড়ির পর যোগেশদার দপ্তরে এসে নিতে হল একতাড়া তালপাতা, কঞ্চির কলম ও মাটির নতুন দোয়াত। আর বাড়ির বুড়ো আধবুড়ো, ছোকরা কর্মচারী সবারই পায়ের ধুলো ও আশীর্বাদ নিতে হল। তারপর দিনই সরস্বতী পুজো। সরস্বতী ঠাকুরের কাছে দোয়াত, কলম, বই শেলেট রামলাল দিয়ে এল। তবে যে গুরুমশায়টি হাতে খড়ি দিয়েছিলেন তার কথা মনের খোপে ধরা রইলনা ছেলেটির।

ঠাকুরঘরে যাওয়ার পথে ছোট ছেলেটির চোখ পড়েছিল কালী ভাণ্ডারী আর অমৃতা দাসীর উপর। ভীষণ দর্শন কালী ভাণ্ডারীর স্মৃতি এভাবে জেগেছে মনে—

...কাঠের গরাদে আঁটা একটা জানলা— সেই জানলার ওপারে অন্ধকার ঘরের মধ্যে কালো একটা মুর্তি জালা থেকে কী তুলছে। লোকের শব্দ পেয়ে সে মুর্তিটা গোল দুটি চোখ নিয়ে আমার দিকে দেখতে থাকল। এর অনেককাল পরে জেনেছিলাম— এ লোকটা আমাদের কালী ভাণ্ডারী— রোজ এর হাতের রুটিই খাওয়ায় রামলাল। কালী লোকটা ছিল ভালো, কিন্তু চেহারা ছিল ভীষণ।

আলিবাবার গল্পের তেলের কুপো আর ডাকাতের কথা পড়ি আর মনে পড়ে এখনো কালীর সেই সেদিনের চোখ, গরাদে আঁটা ঘর আর মেটে জালা।

এরপর দেখা গেল একটি দাসীকে যার হাত দুটো মোটামোটা— গোল দুখানা পাথর একটার পর একটা রেখে এটা হাতল দিয়ে অবিরাম ঘুরিয়ে চলেছে আর ছড়িয়ে পড়ছে ভাঙা সোনা মুগ। এই সোনা মুগের ডাল কাজে লাগে প্রত্যেকের খাবারের সময়। আর আছে অমৃত দাসী সে একটা শিল নোড়ায় ঘষাঘষি করে ঘটর ঘটর শব্দ তুলছে। সে তৈরি করছে নানারকম রান্নার মশলা।

সেই ছোট্ট ছেলেটির জীবনে একটি মজার ঘটনা ঘটেছিল তা পরিণত বয়সেও মনে আছে। ছেলেটির মা তাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন কাটোয়ায় ছোট পিসিমার শ্বশুরবাড়ি। পথে ধানখেতের মধ্যে দিয়ে চলেছে পালকি। সঙ্গের দাসী একগোছা ধানের শিষ মাকে দিয়েছেন। মাও আদর করে ছেলেকে দিয়েছে দু-একটি ছড়া। মা চলছেন আনমনে মাঠঘাট দেখতে দেখতে, আর ছোট ছেলেটি ধানের শিষ নিয়ে খেলতে কখন যে মুখের মধ্যে চলে গিয়েছে তার ঠিক নেই। মুখের মধ্য দিয়ে গিয়ে গলায় গেছে আটকে। দমবন্ধ হবার মত অবস্থা। যাইহোক কোন রকমে ফাঁড়া গেল কেটে।

আর আছে 'ব্যাপটাইজ্‌ড' হওয়ার গল্প। একদিন একটা চায়ের মজলিসে নীল মখমলের কোট আর প্যান্ট পরে গেছি— একটি সাহেব সুবো গোছের মানুষ ছেলেটিকে ডাকলো ইশারায়। চায়ের ঘরে ঢুকতে মানা ছিল আগে থেকেই— তবুও রামলালের নির্দেশে যেতে হল। যাওয়ার আগে রামলাল কানের কাছে চুপি চুপি বললে— 'যাও ডাকছেন, কিন্তু দেখো, খেয়োনা কিছু।' সাহস পেয়ে সোজা চলে গেল ছেলেটি চায়ের চেবিলের কাছে।

যেখানে রুটি-বিস্কুট, চায়ের পেয়ালা, কাঁচের প্লেট, তখ্‌মা ঝুলানো বাবুর্চি, আগে থেকে মনকে টানছিল।' তাই সেই সাহেব মানুষটার ডাকে চলে গেছে ছেলেটি আর 'মিনিট কতক পরে একখানা মাখন মাখানো পাউরুটি চিবোতে চিবোতে বেরিয়ে আসতেই আড়ালে কেদার দাদার সামনে পড়লেম। ছেলেমাত্রকে কেদার দাদার অভ্যাস ছিল 'শালা' বলা। তিনি আমার কানটা মলে দিয়ে ফিসফিস করে বললেন— যাঃ শালা ব্যাপটাইজ হয়ে গেলি। রামলাল একবার কটমট করে আমার দিকে তাকিয়ে বললে— 'বলেছিলুম না, খেয়ো না কিছু।

সেই ব্যাপটাইজ্‌ড হবার কথাটা রটে গেল। অনেকেই জেনে গেছে। মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। আনমনে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াই। হঠাৎ ছোট পিসিমা একদিন জিজ্ঞেস করলেন আমার মন খারাপের কথা। ছোট পিসিমার কাছে সব স্বীকার করতে হল। তিনি রামলালকে ডেকে মাথায় গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিতে বললেন। রামলাল নিয়ে গিয়ে পঞ্চগব্যি দিয়ে শুদ্ধ করলে ছেলেটিকে। এখানেই অসমাপিকার শেষ।

'আপন-কথা'র একেবারে শেষ প্রসঙ্গ 'বসতবাড়ি'।

যতদিন মানুষের সঙ্গ পাচ্ছে বসতবাড়িটা— ততক্ষণ সে জীবন্ত, যখন তাকে মানুষ ত্যাগ করে চলে যায়, তখন হয় তার মৃত্যু— লেখকের ভাষায় আসল মৃত্যু। এরপর সে স্মৃতি হয়ে যায় ও ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের অধিকারে চলে যায়। এই তিনতলা বসতবাড়িটি যদি কোনো মারওয়াড়ি বা অন্য কেউ কিনে নেয়— একেবারেই লোপ পাবে সেকালের সব স্মৃতি। সেকালের বদলে একালটাই আসবে চলে। লেখকের মতে স্মৃতির সূত্রে নদীধারার মতো চিরদিন চলে না, ফুরোয় একসময়। এই বাড়িরই ছেলেমেয়ে তাদের কাছে আমাদের সেকালের স্মৃতি নেই বললেই হয়। আমার মধ্যে দিয়ে সেই স্মৃতি— ছবিতে, লেখাতে, গল্পে— যদি কোনো গতিকে তারা পেল তো বর্তে রইল সেকাল বর্তমানেও। না হলে কুচনো ফুলের মতো, হাওয়ায় উড়ে গেল একদিন হঠাৎ কাউকে কিছু না জানিয়ে।

উপরের লেখায় শিশু অবনকে 'ছোট ছেলেটি' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। শিশু অবনের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে সেবাড়ির অনেক কথা। এই 'আপনকথায়' শুধু সেবাড়ির কথা, সেকালের কথা নয়। 'ঘরোয়া' ও 'জোড়াসাঁকোর ধারে'তে কিন্তু শুধু বাড়ি নয় সেকালের কথাও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে।

রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিবারের সন্তান হলেও তাঁরা একই বাড়ির নয়। প্রথম জন ভদ্রাসন বাড়ির ও দ্বিতীয়জন বৈঠকখানা বাড়ি। এ বিষয়ে আরও একটু আলোকপাত করা দরকার।

দ্বারকানাথের পাঁচ পুত্রের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ, গিরীন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথ সংসারজীবনে প্রবেশ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে নগেন্দ্রনাথ নিঃসন্তান অবস্থায় স্ত্রী ত্রিপুরাসুন্দরীদেবীকে রেখে মাত্র ঊনত্রিশ বৎসর বয়সে ২৪ অক্টোবর ১৮৫৮ তারিখে প্রয়াত হন। গিরীন্দ্রনাথও মাত্র ৩৪ বৎসর বয়সে ১৯ ডিসেম্বর ১৮৫৪ তে প্রয়াত হন। মৃত্যুকালে তিনি পত্নী যোগমায়াদেবী, দুই পুত্র গণেন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথ এবং দুইকন্যা কাদম্বিনী ও কুমুদিনীকে রেখে যান। ১৮৫৯-এ গৃহদেবতার নিত্যপুজা ও অন্যান্য বৈষয়িক কারণে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে মনান্তর হওয়ায় দ্বারকানাথের উইল করা বৈঠকখানা বাড়ি (৫নং বাড়ি)* গিরীন্দ্রনাথের অধিকারে আসে এবং দেবেন্দ্রনাথের পরিবার ভদ্রাসন বাড়িতে (৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন) উঠে আসেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার বলতে এই ৫নং ও ৬নং দ্বারকানাথ লেনের দুটি পরিবারকেই বোঝায়। আনুষ্ঠানিক দিক দিয়েই দুটি পরিবারের বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। গিরীন্দ্রনাথের পরিবার দোল দুর্গোৎসব প্রভৃতি সমস্ত হিন্দু পৌত্তলিক আচার

* এই ৫ নং বাড়িটি পরে বিক্রি হয়ে গেলে অবনীন্দ্রনাথ, বরানগরে গুপ্ত নিবেসে চলে যান ও সেখানেই তাঁর প্রয়াণ ঘটে।

আচরণকে অনুসরণ করেছে অপরদিকে দেবেন্দ্রনাথের পরিবারে পৌত্তলিকতা সম্পূর্ণভাবে বর্জিত হয়েছিল।

আরও এগিয়ে গিয়ে বলা যায় ১৬ আগস্ট ১৮৪৩ (বুধ ১ ভাদ্র ১২৫০) দ্বারকানাথ দ্বিতীয়বার বিলেত যাত্রার আগে একটি উইল করেন। এই উইলে তিনি ভদ্রাসন বাড়ি দেবেন্দ্রনাথকে, বৈঠকখানা বাড়ি গিরীন্দ্রনাথকে ও ভদ্রাসন বাড়ির পশ্চিমদিকের সমস্ত জমি ও বাড়ি তৈরির জন্য ২০,০০০ টাকা নগেন্দ্রনাথকে দিয়ে যান। কার-ঠাকুর কোম্পানির যে অর্ধাংশ তাঁর অধিকারে ছিল, তার সবটাই তিনি দেবেন্দ্রনাথকে দিয়ে যান। এছাড়া এই উইলে দরিদ্রসেবার জন্য এক লক্ষ টাকা ধার্য ছিল।

উল্লিখিত গুণেন্দ্রনাথের সঙ্গে সৌদামিনীদেবীর বিয়ে হয়। এদের চারটি পুত্র ও দুটি কন্যা। পুত্ররা হলেন গগনেন্দ্রনাথ (১৮৬৭-১৯৩৮), সমরেন্দ্রনাথ (১৮৭০-১৯৫১), অবনীন্দ্রনাথ (১৮৭১-১৯৫১) ও কুমারেন্দ্রনাথ বা র‍্যাট— শিশুবয়সেই মারা যান। আর কন্যা বিনয়িনী ও সুনয়নী।

> পরবর্তীকালে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি বাংলার সাংস্কৃতিক জগতে যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল, তার ভিত্তি রচনা করেন দ্বারকানাথ। অর্থ, আভিজাত্য, সম্মান ও প্রতিপত্তি দিয়ে তিনি এই পরিবারকে যে বিশিষ্টতা দান করেন, পুত্র দেবেন্দ্রনাথ তার সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন ধর্মমহিমা; পরবর্তী পুরুষে একদিকে পৌত্র রবীন্দ্রনাথ ও অন্যদিকে প্রপৌত্র অবনীন্দ্রনাথ সাহিত্য ও শিল্পের গৌরব যুক্ত করে এই বাড়িকে বাঙালির তীর্থস্থানে পরিণত করেছেন। (প্রশান্তকুমার পাল রবিজীবনী ১ম, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৪২০, পৃ ১১)

গুরুদেব একবার মন্তব্য করেছিলেন

অবনের খেলনাগুলো দু-তিন বার করে না দেখিয়ে একটা পাবলিক একজিবিসন করতে বলিস। খুব ভালো হবে। সবাই দেখুক, অনেক কিছু শিখবার আছে। লোকের সৃষ্টিশক্তির ধারা কত প্রকারে প্রবাহিত হয় দেখ্। ছবি আঁকত, তারপরে এটা থেকে ওটা থেকে এখন খেলনা করতে শুরু করেছে, তবু থামতে পারছে না— আমার লেখার মতো। না, সত্যিই অবনের সৃজনীশক্তি অদ্ভুত। তবে ওর চেয়ে আমার একটা জায়গায় শ্রেষ্ঠতা বেশি, তা হচ্ছে আমার গান। অবন আর যাই করুক, গান গাইতে পারে না। ওখানে ওকে হার মানতেই হবে।' এই বলে হাসতে লাগলেন।

আশি বছরের খুড়ো সত্তর বছরের ভাইপোকে এই বলে সম্মান জানাচ্ছে। এটা কম কথা নয়। রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথের 'ঘরোয়া'র জন্য একটি ভূমিকা লিখে দেন। ভূমিকায় তিনি লেখেন—

> আমার জীবনের প্রান্তভাগে যখন মনে করি দেশের হয়ে কাকে বিশেষ সম্মান দেওয়া যেতে পারে, তখন সর্বাগ্রে মনে পড়ে অবনীন্দ্রনাথের নাম।

তিনি দেশকে উদ্ধার করেছেন আত্মনিন্দা থেকে, আত্মগ্লানি থেকে তাকে নিষ্কৃতি দান করে তার সম্মানের পদবী উদ্ধার করেছেন। তাকে বিশ্বজনের আত্ম-উপলব্ধিতে সমান অধিকার দিয়েছেন। আজ সমস্ত ভারতে যুগান্তরের অবতারণা হয়েছে চিত্রকলায় আত্ম উপলব্ধিতে। সমস্ত ভারতবর্ষ আজ তাঁর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশে এই অহংকারের পদ তাঁরই কল্যাণে দেশে সর্ব্বোচ্চ স্থান গ্রহণ করেছে। এঁকে যদি আজ দেশলক্ষ্মী বরণ করে না নেয়, আজও যদি সে উদাসীন থাকে, বিদেশী খ্যাতিমানদের জয় ঘোষণায় আত্মাবমান স্বীকার করে নেয়, তবে এই যুগের চরম কর্ত্তব্য থেকে বাঙালি ভ্রষ্ট হবে। তাই আজ আমি তাঁকে বাংলাদেশে সরস্বতীর বরপুত্রের আসনে সর্বাগ্রে আহ্বান করি।

শান্তিনিকেতন
১৩ই জুলাই, ১৯৪১

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের এই শংসাপত্রের পর আর কোনো মন্তব্য সমীচীন নয়।

তথ্যঋণ
১. অবনীন্দ্র রচনাবলী (১ম), প্রকাশভবন, সপ্তম প্রকাশ, ২০১৯।
২. প্রশান্তকুমার পাল রবিজীবনী (১ম) আনন্দ সং, অষ্টম মুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ ১৩২০।
৩. পশ্চিমবঙ্গ সরকার তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, অবনীন্দ্রসংখ্যা, ১৪০২।
৪. বৈশাখী ২২ সংখ্যা ২০১২-১৩, অবনীন্দ্র সংখ্যা
৫. অবনীন্দ্রনাথ রচনা সমগ্র (২য় খণ্ড) দে'জ পাবলিশিং